**পঞ্চাশের দ্বারপ্রান্তে যে বিজয় দিবস**

[](https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2020/12/08/image-372032-1607370257.jpg)

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে দেশ। ইতিহাসের এমনই এক সন্ধিক্ষণে উপনীত এবারের বিজয় দিবস। দিবসটির প্রাসঙ্গিকতায় যুক্ত হয়েছে নানা মাত্রা, নানা তাৎপর্য। জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের দুর্লভ মুহূর্তগুলো নতুন প্রজন্মের ইতিহাসবোধ নির্মাণে নতুন উপাদান, নতুন দর্শন হাজির করছে। একটি মুক্তসমাজ গঠনের সংকল্পে বাঙালির এ উত্থান সে সময় খুব একটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না।

বিভক্ত বিশ্বব্যবস্থা, কৌশলগত ভূ-রাজনীতি বা আদর্শগত দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বটিকে জটিল করে রেখেছিল। এ অবস্থা থেকে সুবিধা নিয়েছিল পাকিস্তান। চীন-আমেরিকার অব্যাহত সমর্থন পাকিস্তানকে উত্তরোত্তর আগ্রাসী করে তুলেছিল। শুধু ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য নয়, দেশের সম্পদ লুণ্ঠনেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বেপরোয়া মনোভাব ধরা পড়েছিল।

সম্পদ, সংস্কৃতি বা রাষ্ট্রীয় সুবিধা থেকে কেবল বাঙালি বঞ্চিত হয়নি, ৭০-র প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ’৬৫-র যুদ্ধে দেশের পূর্ব সীমান্তকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে বাঙালি সৈন্যদের পশ্চিম রণাঙ্গনে মোতায়েন করে পাকিস্তান প্রমাণ করে দিয়েছিল- বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে পূর্ববাংলা নিরাপদ নয়; বরং প্রতিবেশীর করুণার ওপরই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।

পক্ষান্তরে চাকরি, ব্যবসা বা রাষ্ট্রীয় সেবার সর্বত্র প্রবল হয়ে ওঠা তীব্র বৈষম্য ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার মাদকতা থেকে বাঙালিকে দ্রুত মুক্তি দেয়। স্বাধিকার অর্জনের পথে জাতি এগিয়ে যায় একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের প্রত্যাশায়।

প্রবল পরাক্রমশালী বিশ্বশক্তির মদদপুষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়া সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সুসংগঠিত এ সংগ্রাম-শৃঙ্খলা, ঐক্য ও দৃঢ়তার অনন্য নজির স্থাপন করে একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

আর এটিও তর্কাতীতভাবে সত্যি যে, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই জাতি কালের এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাজার বছরের স্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠে। তবে এ বিজয়ের মূল্যও নেহাত কম ছিল না। লোমহর্ষক এক গণহত্যার সাক্ষী হয় দেশ। ৩০ লাখ নর-নারী শহীদ হয়। নির্বিচার ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এমন বীভৎস হত্যালীলার নজির নেই বলেই মনে করেন অনেক গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী।

এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর আজ সঙ্গতভাবেই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দেশ। বিজয়ের গতি-প্রকৃতি, সাফল্য-ব্যর্থতা কিংবা রাষ্ট্রের চরিত্র- সবকিছুই আজ উন্মুক্ত বিশ্লেষণের টেবিলে। দৃষ্টির বৈচিত্র্য ভাবনার সীমাকে প্রসারিত করে। চিন্তার নতুন জগৎ তৈরি করে। আমরা যদি রাষ্ট্রের দৃশ্যমান অর্জনের দিকে নজর দিই, অবশ্যই সেখানে স্বস্তির বার্তা খুঁজে পাই। পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্র থেকে এ দেশের জন্ম হয়েছিল, সে রাষ্ট্রই এখন সক্ষমতার প্রায় সব সূচকেই আমাদের পেছনে।

মানব উন্নয়ন, নাগরিক সক্ষমতা, শাসনব্যবস্থা কিংবা মানবাধিকার- সবক্ষেত্রেই দেশ অনেক এগিয়ে। পাকিস্তানের আইনসভাতেও হতাশার সেই সুর বেজে ওঠেছে। উন্নয়নের অনেক মাপকাঠিতে প্রতিবেশী ভারতও এখন আমাদের পাশে ম্লান। সমৃদ্ধি বুঝতে এখন বিশেষজ্ঞ লাগে না। পরিবর্তনের আভাস এখন সবখানেই। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শিল্প-কৃষি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, রাস্তা-ঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য; এমন কী প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যরে প্রশ্নেও অগ্রগতির নমুনা আছে। দুর্নীতির বিস্তার ঘটলেও দুর্নীতি দমনে সাফল্য আছে। প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথেষ্টই স্বাধীনতা ভোগ করছে। এ বিষয়ে হয়তো সবাই একমত- দেশ স্বাধীন না হলে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র কিংবা বিশ্ব পরিসর; সর্বত্রই আমরা যে মর্যাদা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সক্ষমতার নজির রেখে চলেছি, তা কখনই সম্ভব হতো না।

একটি বৈষম্যহীন মুক্তসমাজ গঠনের অব্যাহত আকাঙ্ক্ষার ফসল বাংলাদেশ। জাতি যখন মুক্তির ৫০ বছর পূর্তির অপেক্ষায় উন্মুখ, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে- রাষ্ট্র জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হয়েছে। আসলে রাষ্ট্রের যখন পথচলা আরম্ভ, প্রায় তখন থেকেই বিপত্তির শুরু। যে জাতি সর্বস্ব ত্যাগ করে হানাদারদের পরাজিত করল, সে জাতিকেই লড়তে হল নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে, লোভকে সামলে নিতে তাকে হিমশিম খেতে হল। সদ্য স্বাধীন দেশে এক শ্রেণির মানুষের এমন নৈতিক স্খলন জাতির পিতাকে বিচলিত করে তুলেছিল।

অন্যদিকে মুক্ত দেশের বাতাসে ছিল পোড়ামাটির গন্ধ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ভয়ংকর ধ্বংসের চিহ্ন, প্রতিহিংসার আগুনে ভস্ম খাদ্যগুদাম, বাড়িঘর, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট; রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। এমন একটা ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পুনর্গঠনে একাগ্রচিত্ত, একটু একটু করে গুছিয়ে নিচ্ছেন, দৃষ্টি তার স্বপ্নের সীমা পেরিয়ে, সোনার বাংলার স্বপ্নসৌধ কেবলই তাকে হাতছানি দিচ্ছে; এমন সময় ঘটে গেল মানবসভ্যতার নিষ্ঠুরতম ট্র্যাজেডি।

পাকিস্তান এদেশে শুধু হত্যা-লুণ্ঠনের চিহ্ন রেখে যায়নি; তাদের তাঁবেদার অনুগামীদের মনে যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বীজ পুঁতে গিয়েছিল, তাই মহীরুহে পরিণত হল। লুটেরা, মতলববাজ, উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক ও পাকিস্তানপন্থী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের গভীর ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। উল্টোপথে চলতে শুরু করল দেশ।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর যে পরিবর্তনগুলো সমাজমনে দীর্ঘমেয়াদি ছাপ ফেলতে শুরু করল, তা হল রাষ্ট্রীয় মদদে অনৈতিকতার অনুশীলন। হয়তো শুরুটা তার ইনডেমনিটি দিয়ে। পেশি ও অন্যায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে ন্যায্যতা দেয়া হল। রাজনীতি ও অর্থনীতির চরিত্র বদলে যেতে লাগল। রাজনীতির ঐতিহ্য ও বিশুদ্ধতাকে কালিমালিপ্ত করার দম্ভোক্তি এলো প্রকাশ্যে। অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভ উসকে দেয়া হল।

ন্যূনতম সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ইঁদুর দৌড় সমাজ থেকে যুগলালিত মূল্যবোধ উপড়ে ফেলতে লাগল। ঘোলাজলে মাছশিকারে তৎপর হয়ে উঠল ওৎ পেতে থাকা স্বার্থান্বেষী চক্র। উগ্র ধর্মান্ধগোষ্ঠী, উঠতি ধনিক শ্রেণি ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের এক অশুভ আঁতাত সমাজবুননের কাঠামোকেই পাল্টে ফেলতে মরিয়া হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এমন জায়গায় এসে পৌঁছাল, মত-পথ নির্বিশেষে প্রায় সব শাসকগোষ্ঠীই একপর্যায়ে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করতে ধর্মকে পাকিস্তানি কায়দায় ব্যবহার করতে শুরু করল; ধর্মের প্রকৃত দর্শন ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষিতই থেকে গেল।

মুখে যারা ধর্মের কথা বলে, জাতীয়তাবাদের কথা বলে- ব্যক্তি পরিসরে তাদের জীবনচর্চার আদল হয়তো সম্পূর্ণই আলাদা। নিজের সন্তানদের এরাই ইংরেজি মাধ্যমে বিদেশি ভাবধারায় গড়ে তোলে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক মানুষের জন্য অবশিষ্ট থাকে মাদ্রাসা, কারিগরি বা পরিচর্যাহীন সাধারণ শিক্ষা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে ওঠা গণমুখী শিক্ষাভাবনা থেকে সরে আসে রাষ্ট্র। বিভক্ত শিক্ষাকাঠামোয় বৈষম্যের বুনিয়াদ পোক্ত হতে থাকে নীরবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার এ অসাম্য মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যকে কক্ষচ্যুত করে বারবার। একথাও সত্যি- দেশে অর্থনীতির আকার বেড়েছে, বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছে। নাগরিকের সামর্থ্যও বেড়েছে। অঢেল বিত্তের মালিকও হয়েছে এক শ্রেণির মানুষ। সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ- এ অর্থের বড় একটা অংশ জমা হচ্ছে বিদেশের ব্যাংকে। একদিকে ধনবৈষম্য, অন্যদিকে অর্থ পাচার। যেখানে দেশপ্রেম, ধর্ম, নীতি, জাতীয়তার বুলিকে ভীষণ ফাঁপা বলেই মনে হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, আমাদের আচরণের ভঙ্গি দুর্বোধ্য স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ।

রাজনীতির মঞ্চে যেসব দেশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারই আমাদের একমাত্র পুঁজি- বাণিজ্য, চিকিৎসা কিংবা অভিবাসনের স্বার্থে সেসব দেশই আমাদের সাধারণ গন্তব্য। চরম ভারতবিদ্বেষও চিকিৎসাসেবার জন্য ভারতনির্ভরতাকে পাশ কাটাতে পারে না, উগ্র ধর্মান্ধতাও এদেশের কোনো নাগরিককে ডিভি লটারি বা ইউরোপীয় ভিসার লাইন থেকে সরাতে পারে না; ঠিক যেমন কোনো আদর্শিক নৈকট্যও আমাদের পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা উগ্রবাদকবলিত দেশে অভিবাসী হতে উদ্বুদ্ধ করে না।

আজ যারা ধর্মীয় মূল্যবোধের শুদ্ধতার প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ, তারা দুর্নীতির বিস্তার নিয়ে কথা বলে না, খুন-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ নিয়ে কথা বলে না। শিশুনিগ্রহ, নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে নীরব; এমন কী বিদেশে ধর্মীয় নিপীড়নের প্রশ্নেও এরা সাবধানী, কৌশলী। অর্থাৎ এদের লক্ষ্য রাজনীতি, আর তা নিয়ন্ত্রণ করে নেপথ্যের খেলোয়াড়রা। রাষ্ট্রপরিচালনায় যারা থাকেন, তারাও সময়ে-অসময়ে এদের কাজে লাগান। কাজেই নৈতিক অবস্থান এদের দুর্বলই থাকে।

যেমন- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি বলে দাবিদার একটি বৃহৎ দল মনে করে যুদ্ধাপরাধ বিচারের দায় শুধুই ক্ষমতাসীন দলের। ভাস্কর্য বিতর্কেও এরা সুবিধাই চায়, দায় নেয় না। হয়তো এখানেও তারা অবস্থান বা আদর্শগত নৈকট্য অনুভব করে। তবে মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতা, সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সব দলেরই ন্যারেটিভ এক ও অভিন্ন। বাস্তব ভূমির চরিত্র কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা। স্বাধীনতার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পার করলেও আমরা আদর্শগত, নীতিগত প্রশ্নে কতটা সৎ থাকতে পেরেছি, তা ভেবে দেখা দরকার।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি টিভি চ্যানেলে টক শো চলছিল। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর অর্জন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একজন সাবেক ছাত্রনেতার বক্তব্য শুনে সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। হানাদার বাহিনীর বীরত্ব, শৌর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাকে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখলাম।

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর শতাব্দীর জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছে, অসহায় মা-বোনদের অকথ্য নির্যাতন করেছে, দেশের শ্রেষ্ঠসন্তানদের বেছে বেছে খুন করেছে, আবার সেই ঘাতক বাহিনীরই এক লাখ সশস্ত্র সেনা কাপুরুষের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইতিহাসের অনিবার্য প্রত্যাঘাতে সেই দেশ আজ উন্নয়নের সব সূচকে বাংলাদেশের পেছনে। সেই পরাজিত শক্তির মহিমা বর্ণনায় এ দেশেরই একজন রাজনৈতিক কর্মী যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না। মনোজগতের এমন দেউলিয়াত্ব, এমন স্ববিরোধিতা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

আরও একটা প্রবণতা আমাদের ঘরোয়া রাজনীতিতে এখন দৃশ্যমান- তা হল, যে কোনো পথে টাকার মালিক হলেই রাজনীতি করার শখ জেগে উঠছে। সে রাজনীতির অর্থ সেবা নয়, ব্যবসার সুরক্ষা। এর সঙ্গে যদি ধর্মের লেবাস থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। সীমাহীন অর্থলিপ্সা এদের রাজনীতির বৃত্তে টেনে আনছে।

তারা মনে করে, রাজনীতি এখন সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র। বিকাশমান সমাজে এ এক নতুন অসুখ। খেয়াল করে দেখেছি- এরা সব শাসকের সঙ্গেই যুক্ত থেকে আদর্শ ও নীতিকে দলিত-মথিত করে। হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা এ ধনিক গোষ্ঠীর পেছনে যদি রাজনৈতিক শক্তি যুক্ত হয়, তখন এরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

ঠিকাদারি, নদীদখল, হাট-বাজার বন্দোবস্ত, চাঁদাবাজি ইত্যাদি থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু বা দুর্বল জনগোষ্ঠীর সম্পদ দখল করার মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ে। সরকারও এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনেক সময় ইতস্তত করে। ফলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, জনস্বার্থও বিঘ্নিত হয়। এক সময় এরা বড় ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাহস সঞ্চয় করে। সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের এ ধারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

কেউ অস্বীকার করবে না, দেশ এগিয়েছে অনেকটা পথ। করোনাকালেও দেশের অর্থনীতি তার অন্তর্গত সামর্থ্য প্রমাণ করেছে। তবে উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। নৈতিক অবক্ষয়, অসহিষ্ণুতা কিংবা উগ্রবাদের বিস্তার রুখে দেয়ার জন্য জনগণের ঐক্য চাই। জনগণের সার্বভৌমত্বই হল গণতন্ত্রের সারকথা। রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হয় সাংবিধানিক মূল্যবোধের আলোকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি, গণতন্ত্র; এমন কী ধর্ম বিষয়েও আমাদের নৈতিক অবস্থান কী হওয়া উচিত- সে বিষয়ে খোলামনে আলোচনা হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সরকারি দল-বিরোধীদলের সম্পর্কোন্নয়ন, নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি; সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন- এসব বিষয়কে আলোচনার টেবিলে আনা জরুরি।

প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার আত্মঘাতী নজির যেন ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা রাখতেই হবে। ঘৃণা ও প্রতিহিংসার সংস্কৃতি একটি সম্ভাবনাময় দেশের ভবিষ্যৎকে যেন মেঘাচ্ছন্ন না করে, সেজন্য সব রাজনৈতিক দলকে মত-পথের ঊর্ধ্বে উঠে শুভবুদ্ধি ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে- এবারের বিজয় দিবস সামনে রেখে এমন প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি।(Copied)